বঙ্কিমের স্বপ্ন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ
১, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা

দুই আনা

৪, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা
নবজীবন সংঘ হইতে
শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩৪৪ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নদীয়ার আদি-চারণ

শ্রীরামপদ রাহা, শ্রীধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মল মঠ

এবং

শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

কলিকাতা

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭ সাল

প্রীতিমুগ্ধ

বিজয় চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের স্বপ্ন

জাতীয়জীবনে চিরস্মরণীয় সেই দিন—যেদিন 'আনন্দমঠ' লিখিবার জন্য বঙ্কিম লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে কবরের নির্জীব শান্তি আমাদিগকে ঘেরিয়াছিল। পরাধীনতার কোন বেদনা ছিল না। যাঁহারা বড়লোক তাঁহারা ছিলেন দুধ-ঘির যম; আপন আপন অট্টালিকায় সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকিতেন। যাহারা দরিদ্র, অতিদুঃখে তাহাদের দিন কাটিত। দুঃখের বন্ধনকে ছিন্ন করিবার কোন উদ্যম ছিল না। দুঃখের কারণ অন্বেষণেও কোন উৎসাহ দেখা যাইত না। দেশ ব্যাপিয়া একটা ন্যক্কারজনক নিশ্চেষ্টতা;—তামসিকতার চূড়ান্ত! মৃত্যু আসিয়া সমস্ত জাতিটাকে তিলে তিলে গ্রাস করিতেছে; উন্মত্ত সাগরের বুকে ভগ্ন জাহাজ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। সেই ভগ্ন তরীকে বন্দরে লইয়া যাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই, যাত্রীরা হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে। বাঁচিবার পর্য্যন্ত স্পৃহা নাই—মরিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায়। বাঙালীর জীবনের রঙ্গমঞ্চ অতি ক্ষুদ্র-পরিসর। গ্রামের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ। বাঁশঝাড়ের ছায়ায় পৈতৃক ভিটাটী;

তাহাতে লাউ, সিম আর শশার মাচা ; ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে ; সন্ধ্যায় কালপেঁচা চারিদিক সচকিত করিয়া বিকট চীৎকার করে ; নির্জীব একঘেয়ে জীবনযাত্রা—সম্মুখে আশা নাই, আলো নাই। অন্তহীন মহাশ্মশান। এই শ্মশানে আছে শুধু সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য দলাদলির কদর্য্যতা।

একটা জাতির এই অপমৃত্যু কি কেহই বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না? একটা বিরাট জড়তার আবরণে জাতির নব-জন্মের পথ কি চিরদিন অবরুদ্ধ রহিবে? সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে—তাহা অপেক্ষা নীচ জীব পৃথিবীতে নাই—কিন্তু সাপের ঘাড়ে পা দিলে সে-ও ফণা ধরিয়া উঠে। এ জাতির কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হইবে না? পানের বাটা ও বাঁয়া-তবলা লইয়া কতদিন আর কাটিবে? চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বসিয়া 'পাত্রাধার তৈল, কি তৈলাধার পাত্র'—এই তর্কের কি কোন দিনই বিরাম হইবে না? দেশের এই মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া একজনের বুকের মধ্যে গভীর বেদনা ঘনাইতে-ছিল। তিনি ছিলেন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু রাজকার্য্যের বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও দুর্ভাগা স্বদেশের কথা একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ভুলিতে পারিলেন না। একটি আই-ডিয়া তাঁহার বিশাল চিত্তকে সর্ব্বক্ষণের জন্য অধিকার করিয়া রহিল। শ্মশান দেশকে আবার সোনার ভারতবর্ষে রূপান্তরিত করিতে হইবে, এই কর্ম্মকীর্ত্তিহীন দুর্ব্বল দেশ আবার বলবীর্য্যে

মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে, উলঙ্গ নিরন্ন দেশ সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে পুনরায় নব গরিমায় বাঁচিবে, জ্ঞানের শুভ্র দীপ্তিতে গন্তব্যাপী অজ্ঞানের অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। তন্ময় হইয়া ঙ্কিম কল্পনার নেত্রে তাঁহার দীনা-মলিনা জন্মভূমির জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিখানি অবলোকন করিতেন। সেই তন্ময় অবস্থায় তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইল বন্দে মাতরম্। তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশ একদিন অবসাদ আর ভীরুতাকে জয় করিয়া ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তিতে আবার প্রকাশ পাইবে। এই বিশ্বাস না থাকিলে এমন অমর সঙ্গীত রচনা করিবার মত প্রেরণা তিনি লাভ করিতেন না। বঙ্কিম যখন ঐ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি জানিতেন, একদিন আসমুদ্রহিমাচল ঐ সঙ্গীতের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

বাল্মীকির গভীর বেদনা হইতে রামায়ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্কিমের অতি গভীর বেদনা হইতে জাগিয়া উঠিল বন্দে মাতরম্। সূচিভেদ্য দুঃখের অন্ধকারে কারাগারের শৃঙ্খলধ্বনির মধ্যে বসিয়া বসিয়া আপন স্বপ্নকে তিনি রূপ দিতে লাগিলেন। কত রাত্রি, কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি স্বদেশের গৌরবময় ভবিষ্যতের সেই পাগল-করা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিম জানিতেন, জাতির অন্তরে স্বদেশকে নূতন করিয়া গড়িবার যে স্বপ্ন তিনি জাগাইয়া গেলেন, তাহা জোনাকির

আলোর মত ক্ষণস্থায়ী হইবে না, তারার আলোর মত চিরস্থায়ী হইবে। তিনি আরও জানিতেন, ভবিষ্যতে তাঁহার স্বদেশের নগরগ্রাম অরণ্যপর্ব্বত হইতে নদীর নিরবচ্ছিন্ন জলধারার মত বীরের দল আসিবে। সেই বীরের দল তাঁহার স্বপ্নকে নিজেদের জীবনের স্বপ্ন করিয়া তুলিবে, সেই স্বপ্নকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য জীবনের সর্ব্ব প্রিয়বস্তু আদর্শের হোমানলে ইন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করিবে। তিনি সেই বীরবৃন্দের অগ্রদূত, নিশীথের অন্ধকারে আলোর জয়গান গাহিবার জন্য আসিয়াছেন।

আলোর গান গাহিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই মুমূর্ষু জাতির অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীতে নবজীবনের চাঞ্চল্য আনিবার একমাত্র উপায়, একটা বিরাট আইডিয়ার উন্মাদনায় তাহাকে পাগল করিয়া তোলা। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়, ভাবের জোয়ারে পুঞ্জিত অবসাদভার ভাসাইয়া দিতে হইবে। জাতির অন্তরে বঙ্কিম দিলেন আইডিয়ার তাড়িতস্পর্শ। সেই আইডিয়া হইল—'বন্দে মাতরম্'। দেশকে মা বলিয়া বন্দনা কর। মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত' দেশ, এ ত' মা নয়—" ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই,

বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—"। ভবানন্দের কণ্ঠে এ বাণী বঙ্কিমেরই পাগল-করা বাণী।

ছোটখাট আকাঙ্ক্ষা যেখানে জীবনের চলার পথে অন্তরায় হইয়া আছে, সেখানে সেই অন্তরায়কে অপসারিত করিবার একমাত্র উপায় বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন, একটা নৈতিক আদর্শের জন্য বিরাট উন্মাদনার সৃষ্টি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাকে জয় করিবার আর কোন উপায় নাই। জাতির অগণিত নরনারী মেরুদণ্ড হারাইয়া মনুষ্যত্বহীন ক্রীতদাসের অগৌরবের জীবনকে প্রতিদিন বহন করিতেছে কেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার জালে জড়াইয়া আছে বলিয়া। জননীর স্নেহ, প্রিয়জনের প্রেম, ঘরের ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি, প্রিয়ার ভুজবন্ধন, আরও শতসহস্র আকর্ষণ জীবনকে নির্জীব শান্তির নীড়ে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এই সব ছোট ছোট বাসনাকে কর্ত্তব্যের নীরস বুলি আওড়াইয়া জয় করা যায় না। ইহাদিগকে পোষণ করা উচিত নয়—এই ঔচিত্যের বেত্র উঁচাইয়াও ইহাদের বশীভূত করা কঠিন। ঝড়ের মুখে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া যায় তেমনি ইহাদের স্রোতে যুক্তি-বুদ্ধি কোথায় ভাসিয়া যায়। ব্যক্তি বা জাতির অন্তরে যদি একটা moral passion জাগাইয়া দেওয়া যায় তবেই ছোটখাট আকাঙ্ক্ষার স্রোত আপনা হইতেই মন্দীভূত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কামনা আমাদিগকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কামনার ক্ষেত্রে লইয়া এস বৃহত্তর কামনার পাগলামি। জাতির অন্তরে জাগাও আইডিয়ার উন্মাদনা। গর্দ্দভ সিংহ হইয়া উঠিবে, চড়ুই পাখী ঈগলে রূপান্তরিত হইবে। রুসো আর ভলটেয়ার ফ্রান্সের চিত্তে আনিয়াছিলেন আইডিয়ার ঝড়ো হাওয়া—স্বাধীনতা আর সাম্যের দিগ্বিজয়ী আইডিয়া। ফ্রান্স হইয়া ছিল শুষ্ক বারুদের স্তূপ। আইডিয়ার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রেই সেই বারুদের স্তূপ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শতাব্দীর ভীরুতা আর জড়তার আবর্জ্জনা সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। ম্যাজিনি নব্য ইটালীর কণ্ঠে ঢালিয়া দিলেন আইডিয়ার অগ্নিসুরা। সেই সোমরস পান করিয়া ইটালী নবজীবন লাভ করিল। লেনিন ও গোর্কি রাশিয়ান কৃষক আর রাশিয়ান শ্রমিককে নবভাবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। সেই ভাবের মদিরাপানে বিহ্বল রাশিয়া অতীতকে আপন স্কন্ধ হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পথে ছুটিল। ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে এক একজন অতিমানুষ আসিয়া নির্জীব জাতির প্রাণে এক একটা আইডিয়ার প্রেরণা দিয়াছেন; আর সমস্ত জাতি দেখিতে দেখিতে সহসা পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। রুসো আসিয়া বলিলেন, Liberty, Equality and Fraternity; ফরাসী জাতি সেই বাণী শুনিয়া পাগল হইয়া গেল। ম্যাজিনি

আসিয়া নব্য ইটালীর কর্ণে Italian republicএর মহামন্ত্র ঘোষণা করিলেন ; ইটালীতে নবজন্মের সূচনা হইল। লেনিন আসিয়া রাশিয়াকে গায়ত্রী মন্ত্র জপাইলেন, Land to the peasants, Bread to the starving and Peace to all men ; সারা রাশিয়া নবজীবনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিল। বঙ্কিম আসিয়া মোহান্ধ জাতিকে বলিলেন—'বন্দে মাতরম্'। নিদ্রিত জাতি জাগিয়া উঠিয়া নব্যভারতের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—'বন্দে মাতরম্'। গোদাবরী-কাবেরী-নর্ম্মদার উভয় তট মুখর করিয়া ঝঙ্কার উঠিল 'বন্দে মাতরম্'। পুরুষ গাহিল 'বন্দে মাতরম্', নারী গাহিল 'বন্দে মাতরম্'। নূতন ভারতবর্ষ আপনার জপমন্ত্র খুঁজিয়া পাইল। জাতির কর্ণে বঙ্কিম দান করিলেন মুক্তির বীজমন্ত্র। জাতির অন্তরে বঙ্কিম জাগাইলেন দেশাত্মবোধের একটা বিপুল উন্মাদনা, নৈতিক আদর্শের প্রতি একটা দুর্ব্বার আবেগ। সেই উন্মাদনা আর আবেগ জাতির মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল। ব্যক্তি বা জাতি যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া কোন দিনই বড় হয় না।

বঙ্কিম বলিলেন "ভক্তি"।

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল "ভক্তি!"

এই একটী কথায় বঙ্কিম মর্ম্মের সমস্ত ভাবটীকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। দেশের কাজে আপনাকে উৎসর্গ করিব—একটা শুষ্ক কর্ত্তব্যের কঠোর তাড়নায় নয়, সাময়িক ভাবপ্রবণতার উন্মাদনাতেও নয়। শিশু যেমন জননীকে নামের নেশায় 'মা' বলিয়া ডাকে, তেমনি করিয়া জন্মভূমিকে 'মা' বলিয়া ডাকিব। গঙ্গা যেমন প্রচণ্ড আবেগভরে সাগরের অভিমুখে ছুটিয়াছে, তেমনি করিয়া জন্মভূমির পানে ছুটিব। ভক্তি! charity নয়, duty নয়, আপনাকে সমর্পণ করা—জননী জন্মভূমির পদপ্রান্তে আপনাকে সমর্পণ করা—জননী জন্মভূমির পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে বিকাইয়া দেওয়া। জন্মভূমিকে ভালোবাসা আমার পক্ষে duty নয়; উহা হইবে আমার জীবনের সর্ব্বগ্রাসী passion. বঙ্কিম জাতির জীবনে জাগাইলেন moral passion—যাহার বেদীমূলে জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাকে বলি দিতে হইবে।

সত্য। তা' শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রীপুত্রকন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয় ততদিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে, দেখিতে ত' পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু ?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখনো মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করে সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে ?

সত্য। পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে ?

মহে। তা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব ?

সত্য। না ভুলিতে পার—এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

বঙ্কিম দেশসেবা বলিতে অবসরমত ভালোবাসা বুঝিতেন না। তিনি যে দেশপ্রেমের কথা বলিয়াছিলেন তাহা সকল-ডোবানো প্রেম। সেই প্রেমের কাছে জীবনের আর সমস্ত প্রেমকে নির্ম্মমভাবে বলি দিতে হইবে। শ্যাম এবং কুল—দুই রাখা চলে না।

আনন্দমঠের আর এক জায়গায় আছে ঃ—

সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভয়ে। করিব।

সত্য। মাতাপিতা ত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতাভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয়স্বজন ? দাসদাসী ?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন-সম্পদ-ভোগ ?

উভ। সকলই পরিত্যজ্য হইল

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

বঙ্কিম! তোমার প্রতিভার তুলনা নাই। তুমি ছিলে মানুষের মধ্যে অতিমানুষ—সাহিত্য-গগনে তুমি অদ্বিতীয় সূর্য্য। তোমার ললাটে পরানো ছিল অদৃশ্য রাজতিলক। তুমি যাহা আমাদিগকে দান করিয়াছ, তাহার পরিমাণ করা যায় না। তুমি আমাদের কর্ণে দিয়াছ নূতন গায়ত্রী-মন্ত্র, চোখে জাগাইয়াছ নূতন স্বর্গের ছবি, প্রাণে ঢালিয়াছ নবজীবনের রসধারা, হৃদয়মন্দিরে গড়িয়াছ দেশ-জননীর অনবদ্য মুর্ত্তিখানি। তোমাকে শতকোটী প্রণাম!

লজিক না ম্যাজিক ?

সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত—একই সঙ্গে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল বরিশালে। নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন তখন শেষ হয়ে গেছে। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন সদলবলে গান্ধীজীকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। বাঙ্গলায় ফিরে এলেন সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু হ'য়ে। হাতে নন-কো-অপারেশনের জয়ধ্বজা। শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়—বাঙ্গলা দেশের অনেকটা সেই রকম অবস্থা। ভাবের প্লাবন এসেছে আর সেই প্লাবনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। স্বদেশী আন্দোলনের পরে এত বড় আন্দোলন আর বাঙ্গলায় আসে নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের অসহনীয় অপমান সারা দেশের বুকে শেলের মত বিঁধে আছে। সে কি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা! মনে পড়ে, কৃষ্ণনগরের টাউনহলে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রথম যেদিন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের কথা বর্ণনা করেছিলেন—নিস্তব্ধ সভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। সেই অনুভূতি জীবনে ঘন ঘন আসে না। সাধারণতঃ আমরা যে জগতে বাস করে থাকি তার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। সেখানে আছে আমার পুত্র-কন্যা, ভাই-ভগিনী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন; আছে ধানের গোলা, জমি-জমা, দোকান-পাট, টেবিল-চেয়ার, কালি-কলম, আমের বাগান—এমনি কত

কিছু ! বিরাট বসুধাকে আমরা গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলি। হঠাৎ কোথা থেকে আসে এক একটা মুহূর্ত্ত যখন আমাদের গৃহের আঙিনা উদার-দিগন্ত-সীমায় মিশে যায় ; আমরা ভুলে যাই গৃহের প্রাকার, ভুলে যাই দোকান-পাট, জমি-জমা, ধানের গোলা, আদালত, বিদ্যালয়, পুত্রকন্যাপরিবার—সব কিছু। ছিলাম ঘরের মানুষ—হঠাৎ দেখি, কখন পথের পথিক হয়ে গেছি ; সরীসৃপের মত বুকে হাঁটতাম—কখন ঈগল পাখীর মত অনন্ত শূন্যে ডানা মেলে উড়তে আরম্ভ করেছি। অমৃতসরের ট্রাজেডি এমনি একটা অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত এনেছিল জাতির জীবনে। অন্ধকারে গৃহকোণে সুপ্তির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে ছিলাম। বিধাতার বজ্র এলো জালিয়ানওয়ালাবাগের ট্রাজেডির ভয়ঙ্কর রূপ ধ'রে। সেই বজ্রের কড়কড় ধ্বনিতে ভেঙে গেল বহুদিনের নিদ্রা। তার আলোয় চিনলাম দেশমাতৃকার মূর্ত্তিকে। বন্দিনীর অশ্রুসজল করুণ মূর্ত্তি ! বেদনার মধ্যে জাগলো চেতনা। অনুভূতি ছিল না—নিপীড়িত স্বদেশের জন্য অনুভূতি। পাঞ্জাবের অত্যাচার সেই অনুভূতি নিয়ে এল। অনুভূতি যখন এল— তখন সুরু হ'লো জাতির নবজন্ম।

এই নবজন্মের প্রত্যূষে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। সভাপতি বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। সন্ধ্যার কিছু পরে ষ্টিমার ছাড়ল। আমাদের ষ্টিমারে বিপিনচন্দ্র।

জলপথের মনোরম দৃশ্য মনের মধ্যে আজও আঁকা হয়ে আছে। চাঁদ উঠল; নদীর পারে সুপুরির বাগানের মাথার উপরে সে চাঁদের শোভা অপূর্ব্ব। বাগানের পর বাগান আর সেই বাগানের মধ্যে কুটীরগুলি। প্রকাণ্ড নদীর বুক দিয়ে জলরাশি ঠেলতে ঠেলতে আমাদের ষ্টিমার চলেছে বরিশালের অভিমুখে। ভোরের আলোয় চেয়ে দেখি, নদীর দু'পারে জনস্রোত। সেই জনস্রোতের বিজয়োল্লাসের মধ্যে প্রেসিডেন্টের জয়যাত্রা। তখন কে জানত, বরিশাল হবে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সমাধিভূমি? বেলা ন'টা দশটার সময় বরিশালে পৌঁছালাম।

জনাকীর্ণ বিরাট পেণ্ডাল। ক্ষীণকণ্ঠে শীর্ণকায় অশ্বিনী দত্ত তাঁর অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ পাঠ করলেন। 'ভক্তিযোগে'র অশ্বিনী দত্ত, ফুলারী আমলের নির্ব্বাসিত অশ্বিনী দত্ত, পূর্ব্ববঙ্গের একদা মুকুটহীন নরপতি, স্বনামধন্য অশ্বিনী দত্ত! 'ভক্তিযোগ' পড়্‌বার সময় ছাত্র বয়সে কতবার তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছি। অশ্বিনীকুমারের অভিভাষণ শেষ হ'লে শত শত কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে দাঁড়ালেন প্রথিতযশা বিপিনচন্দ্র। খর্ব্বকায় মানুষটী, কিন্তু কি অসামান্য বাগ্মিতা! কবিতার রাজ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাত্মজ্ঞানের জগতে যেমন অরবিন্দ, চিত্রশিল্পের জগতে যেমন অবনীন্দ্রনাথ, বক্তার জগতে তেমনি বিপিনচন্দ্র। যাঁরা তাঁর বক্তৃতা

স্বকর্ণে না শুনেছেন তাঁরা ঠিক ধারণা করতে পারবেন না—কত বড় বক্তা তিনি ছিলেন। যে ভাষায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী মধু ক্ষরণ করেছে সেই ভাষায় বিপিনচন্দ্রের রসনা অগ্নি উদ্গীরণ করে গেছে। বাসর ঘরে প্রেমগুঞ্জন করবার জন্য যে ভাষা তৈরী হ'য়েছে বলে মনে হয়, বিপিনচন্দ্র তাকে ব্যবহার করেছিলেন রণক্ষেত্রে সৈন্যদলকে উৎসাহিত করবার জন্য। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে তিনি ভ'রে দিয়েছিলেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখরদীপ্তি; তার মধ্যে জাগিয়েছিলেন কালবৈশাখীর ঝড়ের হুঙ্কার। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার পর এ যাবৎ অনেক বক্তৃতা শুনেছি; কিন্তু কথা কানে আর প্রাণে তেমন ক'রে লাগে না। ভালো বোম্বাই আম খাওয়ার পর জাগ-দেওয়া দিশী আম যেমন পানসে লাগে সেই রকম। দেশবন্ধুর বক্তৃতার মধ্যে খুবই ভাবপ্রবণতা ছিল—কবির ভাবপ্রবণতা। কিন্তু সে বক্তৃতায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে কাঁপন জাগালেও রক্তে ঝড়ের দোলা লাগত না। বিপিনচন্দ্রের তেজস্বিনী ভাষা রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিত। সেই ভাষা শুনে সাময়িক উত্তেজনায় হাজার হাজার লোক অনায়াসে কোন আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারত। দেশবন্ধু মনের তারে ছড় চালাতে পারতেন; বিপিনচন্দ্রের রসনা লাঙলের মত আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে চ'ষে দিত। কোন দেশে যখন বিপ্লব আসে তখন সেই বিপ্লবের আগুনকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার

জন্য বাগ্মীর প্রতিভার প্রয়োজন হয়। ফরাসী-বিপ্লবের তরঙ্গ-শীর্ষে আমরা দেখেছি—ড্যানটনের (Danton) মূর্ত্তি। একা রোব্‌স্‌পীয়ারের (Robespierre) শক্তি কি করতে পারত—যদি তাঁর অসাধারণ আদর্শনিষ্ঠা আর চরিত্রবলের সঙ্গে ড্যানটনের অসামান্য বাগ্মিতা না মিলত। ড্যান্‌টন বক্তৃতা দিতেন—প্যারিসের হৃদয়-রক্ত দুলে দুলে উঠত। বিপিন পালের প্রতিভার মধ্যে দেখেছি ড্যানটনের প্রতিভা। বিপিনচন্দ্র বাঙ্গলার ড্যানটন। ড্যানটনের মতই তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। নন-কো-অপারেশন অন্দোলন বাঙ্গলাদেশে প্রথম শক্তি সঞ্চয় করেছিল বিপিন পালের বক্তৃতা থেকে। একা দেশবন্ধুর ক্ষমতা ছিল না কলেজগুলিকে ভেঙে দেবার। বিপিন পালের বক্তৃতার ফলে কলেজগুলি ভেঙে যেতে লাগল, যেমন ক'রে বর্ষাকালে তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে হুড়মুড় করে পদ্মার পাড় ভেঙে যায়। আজ বিপিন পাল পরলোকে; জাতীয় জীবনে তাঁর অপরিমেয় দানকে আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাবো না।

কিন্তু বলতে বলতে আমরা পথ ছেড়ে অনেক দূর চলে গেছি। বরিশালের কনফারেন্সে জয়ধ্বনির মধ্যে বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বক্তৃতার সব কথা মনে নেই। অনেক দিনের কথা। একটা কথা মনে আছে। বক্তৃতার মাঝে একটা জায়গায় তিনি ব'লেছিলেন, "পৃথিবীটা কার বশ?

পৃথিবী টাকার বশ।" অমনি সভাস্থল কম্পিত ক'রে শত শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"শেম্, শেম্, সিট্ ডাউন, সিট্ ডাউন।" বিপিনচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন, উকীলদের আদালত ছাড়তে বলা ভুল। আদালতে না গেলে অর্থ আসবে কোথা থেকে? আর অর্থ না হ'লে কোন আন্দোলনই টিঁকবে না। অবিচলিত বিপিনচন্দ্র জনতার প্রতিবাদের উত্তরে সেদিন বলেছিলেন, আমি ম্যাজিক জানি না, লজিক জানি। আবার জনতা গর্জ্জন ক'রে উঠল—"শেম্, শেম্, সিট্ ডাউন, সিট্ ডাউন"। বিপিনচন্দ্রের তখনকার মূর্ত্তি আজও মনে পড়ে—যেন বাণবিদ্ধ সিংহ—পরমায়ু শেষ হয়ে আস্ছে কিন্তু গরিমার অভাব নেই। "রুদ্র, রুদ্র, রুদ্র"—তিনবার তিনি গর্জ্জন ক'রে উঠলেন। সেই কর্ণ-বিদারক সিংহ-গর্জ্জনে পেণ্ডালের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হয়ে উঠল। তারপর বিপুল কোলাহলের মধ্যে তিনি উপবেশন করলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ হয়ে গেল। সিংহ আর গর্জ্জন করল না। বিপিনচন্দ্রের সমাধির উপরে ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু; বিপুল জয়ধ্বনি তাঁকে বাঙ্গলার মুকুট-হীন রাজা ব'লে অভ্যর্থনা ক'রল। এক সূর্য্য অস্ত গেল, আর এক সূর্য্য উঠল।

অনেকদিন কেটে গেছে। বরিশাল আছে—কিন্তু সে বিপিনচন্দ্র নেই, সে দেশবন্ধুও নেই। সেদিনের আন্দোলনের

বেগ লুপ্ত হ'য়ে গেছে, আছে তার স্মৃতি। আজ মনে হয়, এত বড় প্রতিভার এমন শোচনীয় সমাধি হ'ল কেমন করে? কারণ একটা আছে; আর সে কারণ হচ্ছে, বিপিন পাল লজিককে অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব কীর্ত্তিমান পুরুষ অসাধ্য সাধন করে গেছেন, তাঁরা কেউ লজিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। পার্সোনালিটীর ম্যাজিক দিয়ে মরুভূমিতে তাঁরা সোনা ফলিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সব-পাওয়ার জন্য সব-হারাবার একটা যুক্তিহীন উন্মাদনা। জুয়ো খেলে যারা, তাদের বে-হিসেবী মন নিয়ে জন্মায় গান্ধী, লেনিন, ম্যাজিনি আর ডি'ভ্যালেরার দল। গার্ডিনার (Gardiner) লর্ড মর্লির সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "To do great things one must have a certain fearlessness of consequences, an indifference to responsibility, a fanatical faith or the gambler's recklessness" —বড় কাজ করতে হ'লে ফল সম্পর্কে উদাসীন হ'তে হবে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হ'লে চলবে না, বিশ্বাসের মধ্যে একটা অন্ধতা চাই আর চাই জুয়াড়ীর বে-পরোয়া ভাব।" বিপিন পালের মধ্যে ছিল না এই বে-পরোয়া ভাব, ছিল না বিশ্বাসের উন্মাদনা, ছিল না অর্জ্জুনের নির্ভীক উদাসীনতা, ছিল না খেলোয়াড়ের নির্ভীকতা। তিনি

লজিককেই একান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রলেন। হায় বিপিন-চন্দ্র! তুমি এত বুদ্ধিমান ছিলে অথচ এই সত্য বুঝলে না— জাতির ভাগ্য নিয়ে যখন ভাঙা-গড়ার খেলা চলে, তখন লজিকের সেখানে কোন স্থানই নেই। বুদ্ধির কারসাজি দেখিয়ে বাহবা পাওয়া যায় আদালতে আর ডিবেটিং সোসাইটীতে। মগজের কেরামতি দেখিয়ে কে কবে জাতির ভাগ্য পরিচালনা ক'রেছে ? বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে দেশের কাছ থেকে হাত-তালি পাওয়া যায়; দেশের হৃদয় জয় করতে গেলে চাই প্রচণ্ড নির্ভীকতা, চাই হিসাববুদ্ধির একান্ত অভাব। বিশ্বাস করতে হবে স্বাধীনতার অমর আদর্শে, বিশ্বাস করতে হবে জাতির জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যতে। জাতিকে যে নবজীবনের মধ্যে জাগাবে সে হবে সেই ঘোড়ার মত যার দুই চোখে ঠুলি পরানো। He is a horse in blinkers. সে চাইবে না দক্ষিণে, চাইবে না বামে। তার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে লক্ষ্যে নিবদ্ধ আর সেই লক্ষ্যের দিকে সে ছুটে চলে তীরের মত। সে জানে, জনসাধারণ সেই নেতাকে ভালোবাসে যার মধ্যে আছে দ্রুত কর্ত্তব্যনির্ণয়ের ক্ষমতা আর চমকপ্রদ নির্ভীক কর্ম্ম-শক্তি। "Right or wrong—act!" ভুল হোক, নির্ভুল হোক, কাজ কর। দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে দোকানদার যেমন জিনিষ মাপে, একবার পাল্লার এদিকে চায় আবার ওদিকে চায়, বিপিন পাল তেমনি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে নন-কো-

অপারেশনের ভালোমন্দ দু'টো দিক মাপতে লাগলেন। ঝড় এসে গেছে। লজিকের উপাসক সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, ঝড় তাঁকে পিছনে ফেলে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কোন্ ম্যাজিকের স্পর্শে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মেঘখণ্ড দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। সন্দেহ যদি থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এস না; দো-মনা ভাব নিয়ে পরাধীন জাতির জীবনে নেতৃত্ব করা চলে না। গান্ধী যখন নন-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তখন সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্ব্বতপ্রমাণ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। সে সব যুক্তির কথায় গান্ধীজী যদি কর্ণপাত করতেন, তবে তাঁর স্থান হ'ত সপ্রু আর শাস্ত্রীর দলে। যে দিন আশীজন মাত্র অনুচর নিয়ে তিনি সবরমতীর আশ্রমপ্রাঙ্গণ থেকে পদব্রজে যাত্রা করেছিলেন ডাণ্ডীর অভিমুখে, সে দিনই বা তাঁর পক্ষে কতখানি যুক্তি ছিল? মাথার উপরে সশস্ত্র উড়োজাহাজ, সম্মুখে অনলবর্ষী ইস্পাতের শত শত কামান আর উদ্যত সঙ্গীন —তারই সম্মুখে আশীজন নিরস্ত্র মানুষের অভিযান! ছেলে-খেলার মত লাগে; কিন্তু দেখতে দেখতে এই আশীজন লোক আশীলক্ষ লোকে পরিণত হ'ল। লক্ষ মানুষকে জেলে দিয়েও গবর্ণমেন্ট থই পাচ্ছিল না। এখানে বিপিন পালের লজিক ছিল না, ছিল গান্ধীজীর বিশ্বাসের ম্যাজিক। সত্যের যাদুতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অসীম, আর বিশ্বাস ছিল আপন

জাতির উপরে। যাদের বিশ্বাস ছিল না তারা শুধু তীরে ব'সে বিদ্রূপ করেছে আর গাল দিয়েছে। যারা বিশ্বাস করেছে তারা ঝাঁপ দিয়েছে আর দেশকে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিয়ে গেছে।

জনসাধারণের কল্পনাকে অধিকার করতে না পারলে কি নেতৃত্ব করা যায়? মানুষের হৃদয়ের কাছে বাণী পৌঁছে না দিতে পারলে কি সারথ্য করা চলে? গান্ধীজী আনলেন ক্ষত্রিয়ের তেজ আর শৌর্য্যের বাণী—বিপিনচন্দ্রের মধ্যে দেখলাম পাকা ব্যবসায়ীর হিসাবী বুদ্ধির প্রকাশ। হিসাবী বুদ্ধিকে মানুষ ভালোবাসে না, ভালোবাসে সৈনিকের বেপরোয়া ভাবকে। আমরা একজন সৈনিককে পছন্দ করি একজন দোকানদারের চেয়ে। দোকানদার সমাজের তো কম উপকার করে না; সে আমাদের কত জিনিস সরবরাহ করে। পক্ষান্তরে সৈনিকের কাজ শুধু ধ্বংস করা। তবুও কেন সৈনিককে আমরা বেশী ভালোবাসি? ভালোবাসি তার বে-পরোয়া ভাবের জন্য। সৈনিক ব'লতেই আমাদের মনে জাগে ভগ্ন দুর্গপ্রাকারের ছবি; সেই দুর্গপ্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে নির্ভীক বীর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তার এই মরণকে তুচ্ছ করার অপরূপ মহিমাই আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে।

গান্ধীজীকে ভারতবর্ষ যে এত ভালোবেসে ফেললে তার কারণ, আমরা তাঁর মধ্যে দেখলাম নির্ভীক সৈনিক-পুরুষের

বে-পরোয়া ভাব। জীবনের কোন মায়া নেই, সম্পদের কোন মোহ নেই, যশের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, গৃহের কোন আকর্ষণ নেই—আছে শুধু স্বাধীনতার জন্য একটা বিরাট উন্মাদনা। মরণকে যে মানুষ ভয় করে না, মরণের প্রেমে যে মানুষ মজেছে তাকেই তো আমরা ভালোবাসি। দোকানদারী বুদ্ধি নিয়ে যারা জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে না। মানুষ কেন যে সৈনিককে ভালোবাসে দোকানদারের চেয়ে—তার এই ব্যাখ্যা পড়েছিলাম রাস্কিনের লেখার মধ্যে।

বাস্তব জগতের কঠোর সত্যকে যারা বড় মনে ক'রে দেখে, তাদের নিন্দা করি না; কিন্তু বাস্তবতাই জীবনের সবটুকু জুড়ে নেই। বাস্তবকে ছাড়িয়ে আছে এমন একটা রহস্য-লোক যার গভীরতাকে কোন যুক্তি দিয়েই আমরা মাপতে পারি না। মনের জগৎ অপূর্ব; কিন্তু আত্মার জগতেও এমন সব সত্যের আভাস পাই, যার সামনে রসনা নিশ্চল হ'য়ে যায়। বুদ্ধির প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু যেখানে শুধু বুদ্ধিরই আধিপত্য আছে—হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতি নেই—সেখানকার নীরস মরুভূমিতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বুদ্ধির আতিশয্য উত্তুরে হাওয়ার মত; তাতে সব কিছু শুকিয়ে দেয়—ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না। পেট ভরাতে হ'লে চাই অন্ন। গান্ধী দিলেন অন্ন; বিপিনচন্দ্র আনলেন বুদ্ধিমত্তার তুষারশীতল উত্তুরে বায়ু। লজিক শেষ পর্য্যন্ত

জয়ী হ'ল না—জয়ী হ'ল ম্যাজিক। এই ম্যাজিকের জয় আমরা দেখছি আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসে। আইরিস পার্লামেণ্টে ডি'ভ্যালেরা ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি বর্জ্জন করবার পক্ষে যেদিন ভোট দিয়েছিলেন সেদিন তিনি জয়ী হ'তে পারেন নি ; কারণ লজিক ক্ষণকালের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর্থার গ্রিফিথ তাঁর জায়গায় আয়ার্ল্যাণ্ডের সভাপতি হয়েছিলেন। লজিক বলছিল, আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকে বড় কষ্ট পাচ্ছে ; লক্ষ লক্ষ আইরিশ শিশু ক্ষুধার্ত্ত, শীতার্ত্ত ; পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এ দুঃখ আরও বাড়িয়ে লাভ কি ? ইংরেজের কাছে যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাকেই গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু ডি'ভ্যালেরার কাছে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হ'ল না। হয় সব পাবো, নয় সব হারাবো—এমনি একটা সংকল্প ছিল ডি'ভ্যালেরার মনে। লোকে তাঁকে বলতে লাগল গোঁড়া, বন্ধুরা বললে অর্ব্বাচীন, অনেক সহকর্ম্মী তাঁকে ছেড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়লক্ষ্মী ডি'ভ্যালেরাকেই বরণ করে নিল। লজিক টিঁকল না ; নির্ভীক বীরের বে-পরোয়া ভাব জয়ী হ'ল। তিনি যদি ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি গ্রহণ ক'রতেন, তাঁর অবস্থা হ'ত কসগ্রেভের দলের মত শোচনীয়। শেষ পর্য্যন্ত আদর্শনিষ্ঠা আর নির্ভীকতাই জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে।

নাচ, শঙ্করী, নাচ !

নাচ, শঙ্করী, নাচ।

নিদ্রায় অচেতন হ'য়ে আছে প্রাণ—তুমি নাচ, তুমি নাচ।

রক্ত-চরণের আঘাতে রেণু রেণু হ'য়ে চূর্ণ হ'য়ে যাক যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অবসাদ। তুমি নাচ।

ওই তোমার প্রচণ্ড-মনোহর মরণ-নৃত্য! সেই নৃত্যের তালে তালে কত বিস্থবিয়স অগ্নিবমন ক'রে লোকালয়কে করে শ্মশান, কত বিহার আর বেলুচিস্থান ভূমিকম্পে যায় চুরমার হ'য়ে, কত জার কত কাইজারের সাম্রাজ্য ভাঙে রাষ্ট্রবিপ্লবের মুষলাঘাতে, কত লুই আর চার্লসের রাজমুকুট লুটিয়ে পড়ে ধূলায়, কত ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর এসে সমৃদ্ধিশালী জনপদকে ছেয়ে ফেলে অগণিত নরকঙ্কালে। বন্যা তোমার সহচরী, মৃত্যু তোমার অনুচর, মহামারী তোমার ক্রীতদাসী। তুমি শক্তি—যে শক্তি দিয়ে বিধাতা পুরাতনকে ভাঙেন।

তোমার অশরীরী মূর্ত্তির অস্তিত্বকে আজ অনুভব করি অন্তরের শিরায় শিরায়। তুমি কালো, ঝড়ের রাতে সমুদ্র যত কালো—তার চেয়েও তুমি কালো। অমাবস্যার রাতের সমস্ত কালিমাকে লজ্জা-দেয় তোমার বর্ণের কালিমা।

নাচ, শঙ্করী, নাচ !

গলায় তোমার নরমুণ্ডের মালা। হাতে তোমার উলঙ্গ খড়্গ। মহাকালের বন্ধুর পথ বেয়ে তুমি প্রলয়-নাচন নাচতে নাচতে আসছ। সেই পথে ছড়িয়ে আছে বহু সাম্রাজ্যের জীর্ণ কঙ্কাল, বহু অতিকায় জানোয়ারের অস্থিরাশি, বহু প্রাচীন সভ্যতার চিতাভস্ম, বহু মহাবীরের মরিচা-ধরা মলিন তরবারি, বহু দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতির ভগ্ন রাজদণ্ড, বহু জলমগ্ন জাহাজের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ, বহু অপূর্ণ আশার সমাধি, বহু জাতির উত্থান এবং পতনের নিদর্শন।

কত যুগকে অতিক্রম ক'রে আজ এসেছ নবযুগের তোরণ-দ্বারে। তোমাকে প্রণাম করি। তুমি এসেছ যেমন ক'রে ঝড় আসে অরণ্যে। পাতাগুলি যেমন ক'রে ঝ'ড়ো হাওয়ায় কাঁপে তেমনি ক'রে অগণ্য মানুষের প্রাণ আজ কিসের উন্মাদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ! সেই উন্মাদনা তুমি —বাঁধন-ছেঁড়ার তীব্র উন্মাদনা।

নাচ, শঙ্করী, নাচ। নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চল রক্ত-ধারায় মুক্তির দুর্ব্বার কামনারূপে নাচ তুমি। সেই কামনা তো আজ অসংখ্য বুকের পিঞ্জরে বন্দিনী পক্ষিণীর মত ডানায় আঘাত হান্‌ছে।

লক্ষ লক্ষ বক্ষে আজ এই অতৃপ্তির তুষানল জ্বলে কেন ? এই ক্ষুধার মূল রহস্য কোথায় ? এই অশান্তির কি কোন কারণ নেই ?

কি বজ্রকঠোর সঙ্কল্প আজ অগণ্য মানুষের অন্তরে নিয়েছে বাসা! চিত্তে সেই সঙ্কল্পের হোমানল জ্বালিয়ে সুরু হ'য়েছে কোটী কোটী মানুষের তীর্থযাত্রা দুঃখের দুর্গম পার্ব্বত্যপথে। ভয় নেই, কুণ্ঠা নেই, সন্দেহ নেই, ঘরের মমতা নেই, পিছনের জন্য কান্না নেই। তীর্থযাত্রীদের মুগ্ধ-নয়নের সম্মুখে শুধু তোমার মূর্ত্তি। বিদ্যুতের চেয়েও জ্যোতির্ম্ময়ী সেই মূর্ত্তি—আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন গগনস্পর্শী আগুনের স্তম্ভ।

আজ ভয়ের কথা কে বলে? সুবিধার কথা কার মুখে? যুগযুগান্তের বেদনার আগুনে পুড়ে পুড়ে যাদের সঙ্কল্প হ'য়ে গেছে পর্ব্বতের মত সুকঠিন—বহুবর্ষব্যাপী দুঃখের মধ্যে এক হ'য়ে গেছে যাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছু, তাদের পিছন পানে ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। হিমালয় পাহাড়কে সরাতে পারবে, তবু তাদের মুক্তির সঙ্কল্পকে বিচলিত করতে পারবে না। মৃত্যু, নির্ব্বাসন, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা—কোন কিছুই তাদের সঙ্কল্পকে বিচলিত করতে পারবে না।

এই সঙ্কল্প আজ সাগরের এপারে ওপারে সর্ব্বত্র। স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য সঙ্কল্প। সাম্যের অদম্য সঙ্কল্প। আবি-সিনিয়ায়, রাশিয়ায়, ভারতবর্ষে, চীনে—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই ইচ্ছা অসংখ্য নরনারীর চিত্তে দিবানিশি তরঙ্গিত হচ্ছে। এই দুর্দ্দমনীয়

ইচ্ছার সম্মুখে অতীতের জীর্ণ শতাব্দীগুলি ভীত কুকুরের মত সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। বাঁধন-ছেঁড়ার সঙ্কল্প যখন জেগেছে তখন আর ভয় নেই ; বহু জাতির জীবনে যুগান্তকারী ওলটপালট অনিবার্য্য। যে ইতিহাস কোন দিন কোন ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নি— মানুষের সেই নূতন ইতিহাস লেখা সুরু হবে মহাকালের পাতায়।

পুরাতন পুঁজি নিয়ে আর কতকাল চলবে ? মৃত আবর্জ্জনার স্তূপ যে জমে জমে আকাশকে পর্য্যন্ত ছুঁতে চলেছে। ধনীর সঞ্চিত ধন পচে পচে সমাজের রক্তে যে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মোটরকার, সিগার আর শ্যাম্পেন। পকেটে টাকার রিণি রিণি শব্দ। সত্য আর প্রেমের আদর্শ বাসি হ'য়ে গেছে। রক্তপানে স্ফীত জোঁক যেমন ক্লান্ত হ'য়ে ভূমিতে প'ড়ে যায় তেমনি ক'রে আদর্শ থেকে চ্যুত হচ্ছে লক্ষ্যহীন নরনারীর দল।

এই পুরাণ সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনার যুগ ফুরিয়ে এল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে কত মিথ্যার আদর্শের পায়েই না আমরা অর্ঘ্য দিয়ে এসেছি—ঐশ্বর্য্যের পায়ে, পাণ্ডিত্যের পায়ে, ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের পায়ে। মুকুট-পরা রাজার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছি মাথা, গ্রন্থকীট পণ্ডিতের গলায় তুলে দিয়েছি মালা, কৃপাণধারী সেনাপতিকে করেছি কুর্ণিশের পর কুর্ণিশ।

এবার সুরু হ'ক নব আদর্শের আরাধনা। মানুষের পূজা করতে শিখি এখন থেকে। সরল আড়ম্বরহীন মানুষ —যার চিত্তে আছে সাহস আর দেহে আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য। তার গতির মধ্যে নেই কুণ্ঠা, দৃষ্টির মধ্যে নেই সঙ্কোচ, ভাষার মধ্যে নেই জড়তা, জীবনের মধ্যে নেই ভয়ের লেশ। সাধারণ মানুষের গর্ব্বিত ললাটে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেবার যুগ এল।

নাচ, শঙ্করী, নাচ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যে শূন্যগর্ভ অসার আদর্শের পূজা ক'রে এসেছি, সেই আদর্শকে লুটিয়ে দাও ধূলার সঙ্গে। ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ তোমার চরণের আঘাতে দিকে দিকে ভূমিসাৎ হ'য়ে যাক, আসুরিক ক্ষমতার দাম্ভিকতার অবসান হোক, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিমানকে ঝটিকার ফুৎকারে উড়িয়ে দাও। শ্মশান করে দাও এই সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ জগৎকে। তারপর বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তিতে এসে এই শ্মশানের উপর গড়ে তোল মানুষের নব-সভ্যতার সেই অভ্রভেদী মন্দির, যে মন্দিরের শীর্ষে বিজয়-পতাকায় লেখা থাকবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

নারদের স্বপ্ন

কালবৈশাখীর রণতূর্য্য বাজিয়ে, হে রুদ্র, এলে তুমি। তোমাকে নমস্কার করি। বসন্তের ফুলশয্যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি—জীবনের মধুর স্বপ্ন। বনে বনে ফুল ফুটেছে। শিমূলের আর পলাশের রক্তিমায় আকাশ লাল। সবুজ মাঠে ঘাসের ফুল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে। বাতাসে ভেসে আসে মাধবীর মৃদু গন্ধ। আমের বনে কোকিলের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে সুরের ঝঙ্কার। দখিন-হাওয়ায় ওড়ে প্রিয়ার ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর আঁচল। বলয়িত হাতের কোমল পরশে নয়ন আসে নিমীলিত হ'য়ে। শিশুর কাকলিতে গৃহ মুখরিত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি আমি—জীবনের মধুর স্বপ্ন।

নারদ স্বপ্ন দেখে। কৃষ্ণকে বলেছিল সে—ঠাকুর আমাকে দেখাতে পার মায়ার রূপ? ভগবান হাসলেন। একদিন নারদের কাছে আদেশ এল ঠাকুরের জন্য জল আনবার। ঋষি বাহির হ'লেন জলের সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে এলেন এক কুটিরের দ্বারে। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে এক তরুণী নারী। ঋষির হৃদয় থেকে জলের চিন্তা হ'ল অপসারিত। নারদ ভগবানের আদেশ গেলেন ভুলে। তরুণীকে নিয়ে ঋষির গৃহস্থ-জীবনের পালা হ'ল সুরু। দিন যায়, মাস যায়, বৎসরের পর

বৎসর যায় ঘুরে। শিশুদের কলরবে নারদের গৃহ মুখরিত। হঠাৎ না জানিয়ে এক দুর্য্যোগের রাতে এল বন্যা। সেই বন্যায় তার ঘর গেল ভেসে। পত্নী আর পুত্রদের হাত ধ'রে নারদ ভাসতে লাগলেন অকুল জলরাশির বুকে। এমন সময় বন্যার বেগে একটী ছেলে গেল তলিয়ে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটী ছেলেও হ'ল অদৃশ্য। ছেলেদের খুঁজতে গিয়ে স্ত্রীও গেলেন হাত-ছাড়া হ'য়ে। আকুল হৃদয়ে শোকাতুর নারদ ভাবছেন আপনার দুরদৃষ্টের কথা। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর চমক গেল ভেঙে, বন্যা নেই কোথাও। সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে ভগবান তাঁকে বলছেন, জল কই নারদ?

লজ্জিত নারদ এতক্ষণে বুঝতে পারলেন মায়ার স্বরূপ। মায়ামুগ্ধ ঋষিকে সংসার দিয়েছে জলের কথা ভুলিয়ে।

হে কালবৈশাখী, তোমার বজ্রনাদে, তবে, ভেঙে দাও নারদের স্বপ্ন। আমরাও তো স্বপ্ন দেখছি। যে আদেশ বহন ক'রে একদা বেরিয়েছিলাম জীবনের কঠিন বন্ধুর পথে, সেই আদেশ বিস্মৃত হয়েছি সাইরেনের বাঁশি শুনে। সংসার ফেলেছে পাকে পাকে জড়িয়ে, মনকে ঘিরেছে ফেরে ফেরে নাগপাশের মত। জলের কথা গিয়েছি ভুলে। স্বাধীনতার পিপাসা-হরা অমৃত কোথায়?

স্বপ্ন দেখি। তুমি, আমি, সবাই স্বপ্ন দেখি, নারদের স্বপ্ন

দেখি। রূপের স্বপ্ন দেখি, সুখের স্বপ্ন দেখি, খ্যাতির স্বপ্ন দেখি, ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখি, শান্তির স্বপ্ন দেখি; সব স্বপ্নই আছে, শুধু নেই জলের স্বপ্ন—যে জলকে আনতে গিয়ে জালে পড়েছি জড়িয়ে।

জল কোথায়? মুক্তির সেই স্নিগ্ধ জলধারা? যাকে পাওয়ার জন্য একদিন সব ছেড়ে দলে দলে যাত্রা করে-ছিলাম 'আনন্দিত সর্ব্বনাশে'র পথে—হায়! হায়! তাকেই গিয়েছি ভুলে। তৃষ্ণার্ত্ত জনগণ পরাধীনতার কারবালায় শুষ্ককণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে। তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্য তো একদিন অভিযান করেছিলাম সুরু। মনে মনে পণ করেছিলাম, মৃত্যুসাগর মন্থন ক'রে অমৃতরস আহরণ ক'রে আনব আর সেই অমৃতরস পরিবেশন ক'রে ঘুচাব স্বদেশের আপামর-জনসাধারণের পিপাসা। পথে চলতে চলতে কোথায় গেল সেদিনের সেই সংকল্প? আজ জলের কথা ভুলে গিয়ে ঝগড়া করতে সুরু ক'রে দিয়েছি—কে কার চেয়ে বড়—সে কথা প্রমাণ করবার জন্য। আজ প্রাণপণে খুঁজি শুধু শান্তি। বিপদ নেই, আঘাত নেই, কোন কিছু হারাবার আশঙ্কা নেই, বাতায়নপথে রজনীগন্ধার গন্ধ নিয়ে ভেসে আসে ফুরফুরে হাওয়া, বাঁধা-মাইনের চাকরি, কাঁসার থালায় সুগন্ধি অন্ন, স্ত্রী ব্যজন করে, আমের বাগান থেকে পাখীর কূজন আসে। কি মধুর বাতাবি ফুলের গন্ধ।

আঙ্গিনাতে ধানের গোলা আর শিউলি ফুলের গাছ। সাদা বাছুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে। বাইরের ঘরে ফরাস পাতা। বাঁয়া-তবলার সঙ্গে বাজে হারমোনিয়াম। দুপুর বেলায় পাশার দান পড়ে, আর উঠে কলরব। বেশ আছি! মধুর স্বপ্ন! কাজ কি জলের সন্ধানে? কারবালার প্রান্তরে গগনভেদী আর্ত্তনাদ উঠে? উঠুক। সে কান্না থামাবার জন্য ঘর ছাড়তে প্রস্তুত নই।

নব-বৎসরের কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার রথে চড়ে এস হে আমার রুদ্র! স্বপ্ন দাও ভেঙে তোমার কুলিশের কঠোর আঘাতে। কি হবে প্রেয়সীর চুম্বনে আর শিশুর কাকলিতে যদি স্বাধীনতার অমৃত থাকে নাগালের বাহিরে? কি হবে ঐশ্বর্য্যের স্তূপে আর খ্যাতির দুন্দুভিনাদে যদি পরাধীনতার শৃঙ্খল থাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে?

বসন্তের ফুলশয্যায় দাও আগুন। রৌদ্রতপ্ত কণ্টকিত পথ চলে গেছে দিগন্তরে। সেই কঠিন পথের কর পথিক! সুখ নয়, আরাম নয়, শান্তি নয়, বিশ্রাম নয়। বৈরাগ্যের নিশান উড়িয়ে নেচে নেচে যাবো নদীর তালের সঙ্গে তাল রেখে। হে নিষ্ঠুর! দুয়ার সব ভেঙে দাও, মদের পাত্র কর চূর্ণ। নারদের স্বপ্ন দাও ধূলায় গুঁড়িয়ে। যে জল আনবার জন্য বেরিয়েছিলাম একদা দুর্দ্দিনের রাত্রে, সে জল তো এখনো হয় নি আনা। তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা করতে পারি নি দূর।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! ব্যর্থ হয়েছি ব'লে লজ্জা নয়, সংগ্রাম করতে ভুলে গিয়েছি ব'লে লজ্জা। পরাজিত হয়েছি ব'লে দুঃখ নয়, পরাজয়কে চরম ব'লে মেনে নিয়েছি ব'লে দুঃখ। স্বাধীনতাকে এখনও পাই নি ব'লে কান্না নয়, স্বাধীনতার পতাকাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে ঘরের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছি ব'লে কান্না।

হে রুদ্র বৈশাখ! তোমার ঝঞ্ঝার বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাও এই পুঞ্জীভূত নিশ্চেষ্টতা আর অবসাদ, যেমন ক'রে তুমি আকাশে উড়িয়ে দাও শীতের জীর্ণ শুষ্ক পত্ররাজি। তোমার অগ্নিবর্ষী কিরণরাশিতে পুড়িয়ে দাও সুখের স্বপ্ন, নারদের শান্তির স্বর্গ। তোমার বজ্রের উদ্দীপ্ত আহ্বানে বাহির কর নিরুদ্দেশের পথে, অন্তরে জাগাও অমৃতের বেদনা। নারায়ণ কাঁদে, নর-নারায়ণ কাঁদে সেই মুক্তির অমৃতের জন্য।